জঙ্গলমহলের সাত জননী

চিন্ময় দাশ

কেবল ভারতবর্ষ নয়, 'সপ্তমাতৃকা' আরাধনা সারা বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবাংলা কিংবা এই মেদিনীপুর জেলাতেও তার অজস্র নিদর্শন। আমাদের এই নিবন্ধ এত বিস্তৃত বিষয় বা পরিসর নিয়ে নয়। আমাদের আলোচনাটি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার খুবই সীমিত এক পরিসরে সীমাবদ্ধ। অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম – এই দুই জেলার বন-পাহাড় অধ্যুষিত বিশাল এলাকা, যা জঙ্গলমহল হিসাবে বেশি পরিচিত, সেখানে বহু লৌকিক দেব-দেবীর অবস্থান। তাঁদের ভিতর থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় ৭জন দেবীর বিবরণ এখানে পেশ করব আমরা। দেবীর উদ্ভব, বিকাশ, লোকবিশ্বাস, পূজার্চনার রীতিনীতি, লোকাচার, পৌরোহিত্য, মেলার বিবরণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে উল্লেখ করা হবে সাধ্যমত। ক্ষেত্রসমীক্ষা, স্থানীয় অধিবাসী ও পূজকগণের সাক্ষাৎকার এবং কিছু আকরগ্রন্থ পর্যালোচনা— এই তিনটি সহায়তা নিয়ে নিবন্ধটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ব্যক্তিনামগুলি উল্লেখ করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। পুস্তকগুলির তালিকা রচনার শেষে যুক্ত করে দেওয়া হল।

১. সিনি দেবী ঃ

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় যে দু-তিনজন লৌকিক দেবতা রাজত্ব করেন, সিনি তাঁদের একজন। কোনো কোনো আদিবাসী সম্প্রদায় 'সুনিয়া' নামে একটি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। তার অর্থ— আদি, আরম্ভ বা সূচনা। আমাদের অনুমান, সেই সুনিয়া শব্দ থেকে 'সুনি' এবং পরে 'সিনি' শব্দের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। তিনি গ্রামবাসীদের রক্ষয়িত্রী, সর্বরোগ নিবারক, শস্যদায়িনী এবং সর্বোপরি দয়াবতী বৃদ্ধা জননী। সিনিকে তুষ্ট করলে সম্বৎসর সপরিবারে নিরাপদ জীবনযাপন করা যায়। লোকজনমানসে এটিই তাঁর প্রতিচ্ছবি। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর আর পুরুলিয়া প্রধানত বনাঞ্চল অধ্যুষিত সীমান্ত বাংলার এই তিন জেলাতেই সিনি দেবীর আধিপত্য এবং অধিক সমাদর।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার কথা ধরা যেতে পারে। বন আর পাহাড় অধ্যুষিত এই দুই থানা মেদিনীপুরের

সীমান্তবর্তী। এদের উত্তরে বাঁকুড়া জেলা আর পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলা। এই দুটি ব্লকের বহু গ্রামেই সিনি দেবীদের অবস্থান। অগ্রগণ্য লোকদেবী হিসাবেই এই দুই থানায় বিরাজ করেন তাঁরা। উদাহরণ হিসাবে দুই থানার ৭জন করে দেবীর উল্লেখ করছি আমরা। প্রথমে গড়বেতা থানার সিনি দেবীদের কথা বলা যেতে পারে। বর্ণানুক্রমিকভাবে ৭টি নাম হলো —

১. ঝাড়বনিসিনি — অনুমান করা যেতে পারে, তিনি ঝাড়বনি গ্রামের দেবী, সেকারণে তাঁর নাম ঝাড়বনিসিনি। একটি আটচালা মন্দির রয়েছে দেবীর জন্য। তবে পূজার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ নাই। গ্রামবাসীগণ নিজেদের সুবিধামতো দিন নির্ধারণ করে নেন।

২. নাচনজামসিনি — এখানেও গ্রামের নাম হলো নাচনজাম। সেই নামে দেবীর নামটি গঠিত হয়েছে। মন্দির নাই। এবং মূর্তি বা বিগ্রহও নাই দেবীর। হাতি-ঘোড়া ছলনে তিনি পূজিত হন। মকর সংক্রান্তির দিনে দেবীর বাৎসরিক পূজার বিধান। প্রায় আড়াইশ' বছর দেবীর অধিষ্ঠান এখানে। পূজার সময় ২ দিনের একটি মেলা বসে।

৩. বালিবিলাসিনি — এবং **৪. মাচাইসিনি** — খড়িকাশুলী গ্রামে দুই সিনি দেবীর অবস্থান। নির্দিষ্ট থান আছে দেবীদের। আছে পাথরে নির্মিত মূর্তিও। দুই পৃথক দিনে দুজনের পূজা। মকর সংক্রান্তির দিনে বালিবিলাসিনি এবং পয়লা মাঘ বা আইখান দিনে মাচাইসিনির পূজা হয়। পূজায় ছাগ বলি দেওয়ার রীতি আছে। শ'তিনেক বছরের বাৎসরিক একটি মেলাও অনুষ্ঠিত হয় ২ দিনের জন্য।

৫. রূপাসিনি — রূপারঘাগরা নামে এক গ্রামে দেবীর অধিষ্ঠান। এঁর বাৎসরিক পূজার বিধান মাঘ মাসের ৪ তারিখ। কোনও বিগ্রহ বা প্রতীক নাই। হাতি-ঘোড়ার ছলন দিয়ে দেবীর পূজা হয়। এখানে দেবীর মান্যতা রোগ-ব্যাধির উপশমকারী এবং অপদেবতার কুদৃষ্টি নিবারক শক্তি হিসাবে। পূজার দিনে একটি মেলা বসে।

৬. শিকড়াসিনি — ইনি অধিষ্ঠিত আছেন আকছড়া গ্রামে। দেবীর একটি নির্দিষ্ট থান আছে। বিশেষ প্রভাবশালী এই দেবী। তাঁর পূজাও হয় বিশেষ সমারোহের সাথে। মাঘের ২ তারিখ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত – তিন দিনের অনুষ্ঠান। পৌণে একশ' বছরেরও বেশি আগে এখানে একটি মেলার প্রচলন হয়েছিল। বর্তমানে মেলাটিও বসে ৩ দিনের জন্য।

৭. **হল্যাসিনি** — দেবীর অধিষ্ঠান আষাঢ়গ্রাম নামের এক গ্রামে। পয়লা মাঘ বা আইখান দিনে দেবীর পূজা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বনাঞ্চল অধ্যুষিত এই সকল এলাকায় 'সিনি' দেবীর এমনই প্রভাব এবং আধিপত্য, এই থানার ব্রজনাথপুর গ্রামে যে শিবালয়টি আছে, তার শিবলিঙ্গ বিগ্রহটি 'ভৈরবসিনি' নামেই পরিচিত।

খ) বিনপুর থানার ৭ জন দেবী ঃ

১. **আউলাসিনি** — গ্রাম মাণিকপুর। পূজার নির্ঘন্ট মাঘের ৩ তারিখ। পুরোহিত তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত।

২. **কুঁড়াসিনি** — গড়িয়াডাঙ গ্রামে দেবীর অধিষ্ঠান। পুরোহিত তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত।

৩. **খেঁড়াসিনি** — গ্রামের নাম তেঁতুলআড়া। এখানে মাঘের ৭ তারিখে পূজা। ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত, পুরোহিত পৌরোহিত্য করেন। অপুত্রক দম্পতিকে তিনি পুত্রদান করেন, এই বিশ্বাসে পূজিতা হন এখানে।

৪. **ঘাগরাসিনি** — গ্রামের নাম ঘাগরা। হিংস্র বন্য জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে তিনি গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন, এই বিশ্বাসে পশুপাখির বলি দিয়ে দেবীর আরাধনা হয়। মাঘ মাসের কোনও এক দিন। পুরোহিত দিন স্থির করে দেন। বিশাল আকারের মেলার আয়োজন হয় এই দেবীর পূজায়।

৫. **বাঁশকেটাসিনি** — পাপটপুর গ্রাম। মাঝি পুরোহিত। হাতি-ঘোড়া ছলন উৎসর্গ করা হয়।

৬. **ভীমরাজসিনি** — কাঁটাপাহাড়ি গ্রামে এই দেবীর থান। মাঘ মাসে এক দিন দেবীর পূজা। পূজক দিন স্থির করে দেন। বিরাট আকারের মেলা বসে এই উপলক্ষ্যে।

৭. **সাবড়াসিনি** — পাথরঘাটা গ্রামে দেবীর অবস্থান। মাঝি জন-সম্প্রদায় দেবীর পুরোহিত। রীতি অনুসারে, পূজায় ছাগবলি দেওয়া এখানে বাধ্যতামূলক।

এঁদের বাইরে এখানে অন্য একজন সিনি দেবীর কথা বিশেষভাবে বলব আমরা। তিনি হলেন — শাঁখাসিনি। বিনপুর থানার লালগড় এলাকায় তাঁর অবস্থান। তাঁর পূজার কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে, সেকারণে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা।

শাঁখাসিনির কথা ঃ জেহাদ আর প্রাণঘাতী যুদ্ধ – সাম্প্রতিক অতীতে এই দুই কারণে সংবাদের শিরোনামে এসেছিল লালগড়। অতীতে নীলচাষ বা ইংরেজ

৭. **হল্যাসিনি** — দেবীর অধিষ্ঠান আষাঢ়গ্রাম নামের এক গ্রামে। পয়লা মাঘ বা আইখান দিনে দেবীর পূজা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বনাঞ্চল অধ্যুষিত এই সকল এলাকায় 'সিনি' দেবীর এমনই প্রভাব এবং আধিপত্য, এই থানার ব্রজনাথপুর গ্রামে যে শিবালয়টি আছে, তার শিবলিঙ্গ বিগ্রহটি 'ভৈরবসিনি' নামেই পরিচিত।

খ) বিনপুর থানার ৭ জন দেবী ঃ

১. **আউলাসিনি** — গ্রাম মাণিকপুর। পূজার নির্ঘন্ট মাঘের ৩ তারিখ। পুরোহিত তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত।

২. **কুঁড়াসিনি** — গড়িয়াডাঙ গ্রামে দেবীর অধিষ্ঠান। পুরোহিত তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত।

৩. **খেঁড়াসিনি** — গ্রামের নাম তেঁতুলআড়া। এখানে মাঘের ৭ তারিখে পূজা। ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত, পুরোহিত পৌরোহিত্য করেন। অপুত্রক দম্পতিকে তিনি পুত্রদান করেন, এই বিশ্বাসে পূজিতা হন এখানে।

৪. **ঘাগরাসিনি** — গ্রামের নাম ঘাগরা। হিংস্র বন্য জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে তিনি গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন, এই বিশ্বাসে পশুপাখির বলি দিয়ে দেবীর আরাধনা হয়। মাঘ মাসের কোনও এক দিন। পুরোহিত দিন স্থির করে দেন। বিশাল আকারের মেলার আয়োজন হয় এই দেবীর পূজায়।

৫. **বাঁশকেটাসিনি** — পাপটপুর গ্রাম। মাঝি পুরোহিত। হাতি-ঘোড়া ছলন উৎসর্গ করা হয়।

৬. **ভীমরাজসিনি** — কাঁটাপাহাড়ি গ্রামে এই দেবীর থান। মাঘ মাসে এক দিন দেবীর পূজা। পূজক দিন স্থির করে দেন। বিরাট আকারের মেলা বসে এই উপলক্ষ্যে।

৭. **সাবড়াসিনি** — পাথরঘাটা গ্রামে দেবীর অবস্থান। মাঝি জন-সম্প্রদায় দেবীর পুরোহিত। রীতি অনুসারে, পূজায় ছাগবলি দেওয়া এখানে বাধ্যতামূলক।

এঁদের বাইরে এখানে অন্য একজন সিনি দেবীর কথা বিশেষভাবে বলব আমরা। তিনি হলেন — শাঁখাসিনি। বিনপুর থানার লালগড় এলাকায় তাঁর অবস্থান। তাঁর পূজার কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে, সেকারণে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা।

শাঁখাসিনির কথা ঃ জেহাদ আর প্রাণঘাতী যুদ্ধ – সাম্প্রতিক অতীতে এই দুই কারণে সংবাদের শিরোনামে এসেছিল লালগড়। অতীতে নীলচাষ বা ইংরেজ

শাসনের বিরুদ্ধেও জেহাদ দেখিয়েছে লালগড়। কিন্তু এই এলাকার অন্দরমহলে রয়েছে শান্ত স্নিগ্ধ এক সাংস্কৃতিক জীবনের বহমান ফল্গু ধারা। শাঁখাসিনির আরাধনা আর মেলা সেই ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থাকারই এক দৃষ্টান্ত।

আমরা পূর্বেই বলেছি, গ্রাম রক্ষয়িত্রী, শস্যদাত্রী, দয়াবতী বৃদ্ধা, সকল বিপদের উদ্ধারকর্ত্রী হিসাবে ভক্তদের পূজা পান সিনিদেবী। পাহাড়-জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রাম এলাকায় তাঁর অধিক প্রভাব। বাঁকুড়ার পর মেদিনীপুরই সিনি আরাধনায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। জেলার বেলপাহাড়ি আর গড়বেতা এলাকায় সিনির প্রভাব-প্রতিপত্তি যেমন ব্যাপক, তেমনি তাঁর আরাধনায় সমারোহও চোখে পড়বার মতো।

শাঁখাসিনি দেবীর উদ্ভব এবং অবস্থান লালগড় সংলগ্ন এলাকায়। সাড়ে তিন থেকে চারশ' বছর আগের কথা। মধ্যপ্রদেশের এটায়ো থেকে আগত গুণচন্দ্র ও উদয়চন্দ্র নামে দুই ভাই এখানে এসে বসতি গড়েন। এঁদের পরিচয় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, গুণচন্দ্রের দুই পুত্র লালসিংহ ও রামসিংহ প্রথম এই এলাকায় আসেন। এবং তাঁরা এসেছিলেন মানসিংহের বাহিনীর সৈন্য হিসাবে। পরে এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে থেকে যান। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বসু বলেছেন, শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম থেকে ফেরার পথে গুণচন্দ্র ও উদয়চন্দ্রের কোনও পূর্বপুরুষই প্রথম এখানে এসেছিলেন। বৃত্তিতে তাঁরা ছিলেন 'ব্রহ্মভট্ট'। রাজ-পরিবারের সংবাদ বহন বা দৌত্যকার্য করাই সেকালে ব্রহ্মভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণদের পেশা ছিল। একসময় নবাব আলিবর্দী খাঁ নিকটবর্তী জঙ্গলে শিবির স্থাপন করে অবস্থানের কালে, উক্ত দুই ভাই জঙ্গলের ভয়ানক উপদ্রবকারী একটি বাঘকে নিধন করলে, নবাব তাঁদের 'সিংহ সাহস রায়' উপাধি প্রদান করেন। আবার, 'মেমোরাণ্ডা অব্ মিডনাপোর' গ্রন্থে এইচ. ভি. বেইলি বলেছেন— যে বিদেশ ভ্রমণকারী মেদিনীপুরের কোনও এক রাজাকে রাজকুমারের জন্মের সংবাদ প্রদান করায়, রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর অধিকৃত লালগড় ও রামগড় এলাকা এই দুই ভাইকে প্রদান করেছিলেন। যাইহোক, উদয়চন্দ্রের পুত্রসন্তান না থাকায়, পরে গুণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লালগড় ও কণিষ্ঠপুত্র রামগড়ের অধিকারী হন। তাঁদের নামানুসারেই এলাকা দুটির এমন নামকরণ হয়েছিল।

যাক সে কথা। লালসিংহ প্রথম বসতি করেন কংসাবতীর অপরপারে বলরামপুরে। পরে নদী অতিক্রম করে শাঁখাখুল্যা গ্রামে চলে আসেন। কিছুকাল বসবাসের পর কংসাবতী নদীতে ভাঙন ধরতে দেখা যায়। রাজা স্বরূপ নারায়ণ

তখন ক্ষমতায়। কাছাকাছি এলাকায় অপেক্ষাকৃত একটি উঁচু ও নিরাপদ স্থান দেখে প্রাসাদ নির্মাণ করে স্থায়ী বসবাসের জন্য চলে যান তিনি। সেটিই আজকের লালগড়।

শাঁখাখুল্যায় বসত গড়ার পর, বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষদের এনে সেখানে বসত করিয়েছিলেন রাজারা। বিভিন্ন জাতির মানুষে গ্রামটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে, গ্রাম রক্ষয়িত্রী দেবী হিসাবে এক সিনি দেবীরও প্রতিষ্ঠা হয়। লালগড় গ্রামের বর্তমান কুমোরপাড়ার উত্তরে ছিল সেই দেবীর থান। গ্রামের নামে দেবীর নাম হয়েছিল — শাঁখাসিনি। রাজার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম, তাই অতি দ্রুত বিকাশ হয়েছিল গ্রামটির। ফলে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানেরও প্রচলন হয়েছিল। রাজার সুবাদে সেসব হত বেশ জাঁকজমক করেই। রাজবাড়িতে দেওয়াল দুর্গার পূজা হয়। সারা বছর ধরে মহাদেব শিব আর কুলদেবতা রাধামোহন জীউর আরাধনায় কত না অনুষ্ঠান। রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে, সিনিদেবীর পূজাও হত জাঁকজমক করে।

সাধারণ মানুষের প্রাণের দেবী সিনি। সবাই সামিল হত তাঁর পূজায়। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা। ফলে সেসময় বিশেষ ঘটা করে অনুষ্ঠান হত দেবীর। মাঘের দ্বিতীয় দিনে হত বাৎসরিক পূজা। সেদিন বলিরও বিধান ছিল দেবীর পূজায়। লোক সমাগত হত প্রচুর। নদীর এপার ওপার ভেঙে লোক আসত দেবীর থানে। মাঝারি মাপের একটি মেলা বসে যেত সেদিন।

এরপর শাঁখাখুল্যা ছেড়ে স্বরূপ নারায়ণ লালগড়ে চলে গেলেন। পরিত্যক্ত হয়ে আস্তে আস্তে গ্রামটিও জনহীন হয়ে পড়ল। এমনকি দেবীর থানের গায়ে বসত করা কুমারপাড়াটিও উঠে চলে যায় চামটিআড়া গ্রামে। পরিত্যক্ত জনশূন্য গ্রামে দেবী একা পড়ে থাকলেন। একদিন তাঁর পূজাটিও বন্ধ হয়ে যায় দেখতে দেখতে।

কিন্তু পুনরাবৃত্তিও ইতিহাসের এক উপাদান। পুনরায় গত শতাব্দীর সাতের দশকে শাঁখাসিনি দেবীর পূজা শুরু হয় আবার। এবার উদ্যোক্তা চামটিআড়া গ্রামের জয়হরি দাস নামে এক ধর্মপ্রাণ মানুষ।

দেবী জেগে উঠলেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল পাথরের বিগ্রহে। আবার নতুন করে দেবীর প্রতিষ্ঠা হল অগণিত ভক্তের হৃদমন্দিরে। পূজার চল হল। ২ মাঘে বছরের বড় পূজা আর মেলা চালু হল আবার। আবার লোক জমায়েত হল নদীর এপার থেকে ওপার থেকে। দোকানিরা এল পসরা নিয়ে। কেনাকাটার লোকও এসে ভিড় করল তাদের সামনে।

চেহারা আর চরিত্রে একেবারেই মাঝারি মাপ আর গ্রামীণ ধরন এই মেলার।

কিন্তু সিনিদেবীর জন্য ভক্তি আর ভালবাসায় ভরপুর শাঁখাসিনির পূজা আর এই মেলা। গোটা লালগড় এলাকা জুড়ে বনবাসী মানুষজনের একেবারে প্রাণের দেবী তিনি।

২. বড়াম ঠাকুর ঃ

বড়াম হলেন দেবীবিশেষ এবং আদিবাসী সম্প্রদায় এবং নিম্নবর্গীয় মানুষজনের উপাস্য। কিন্তু পরে পরে কোথাও আবার তিনি দেবী চণ্ডিকার অংশবিশেষ হিসাবে গণ্য হয়ে পৌরাণিক দেবী হিসাবে পূজিতা হয়ে চলেছেন। উচ্চবর্গীয় হিন্দু সমাজেও ইনি বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। তবে সেখানে পূজিত হচ্ছেন কেবল ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে।

'আদিমাতা'কে পূজা করার রীতি ছিল আদিম নিষাদ জাতিগুলির মধ্যে। তারই ধারা বেয়ে এসেছে বড়াম ঠাকুরের পূজা। আদিমাতা 'বুড়া মা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকতে পারেন। সেই নামের ধারা বেয়ে, বুড়ামা – বড়মা – বড়াম, এভাবেই নামটির সৃষ্টি সম্ভব। মেদিনীপুর জেলাকে দুই ভাবে বিভক্ত করেছে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত অহল্যাবাঈ রোড বা ও. টি. রোড। এই প্রাচীন পথ মেদিনীপুর নগরীর উপর দিয়েই বিস্তৃত। আদিবাসী সম্প্রদায়ের আদি বাসভূমি প্রধানত এই পথের পশ্চিম অংশেই। এই অংশেই বড়াম দেবীর মুখ্য অবস্থান।

বড়াম ছাড়াও, 'বুড়ি' নাম যুক্ত কত যে লোকমাতা আছেন এই এলাকায়, তার ইয়ত্তা নাই। এই নিবন্ধে 'বুড়ি' নামিত তেমনই দুই লোকদেবীর বিবরণও পেশ করব আমরা।

যাইহোক, বড়াম দেবীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। যা দুটি-একটি দেখা যায়, সে কেবল অর্বাচীন কালের আবেগের ফসল মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর মুণ্ডমূর্তি পূজিত হয়ে থাকে। সেসকল মূর্তির সিংহভাগই ঝামাপাথরে (ল্যাটেরাইট) খোদিত মূর্তি। কোথাও সেটিকে সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে বর্ণময় মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে, দেখা যায়। কোথাও আবার কেবল সিঁদুরে চর্চিত। যেখানে পাথরের মুণ্ডটিকে মূর্তিতে রূপায়িত করা হয়েছে, সেখানে রঙের প্রলেপ দিতে দেখা যায়। মুখ্য দুটি রঙই চোখে পড়ে — হলুদ ও কমলা। শহর বা গঞ্জ এলাকার মূর্তিতে মুকুট বা অন্যান্য অলঙ্কারও যোগ করা হয়েছে কালে কালে।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, যেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে পৌরাণিক দেবী হিসাবে পূজা হয়; সেখানে কোনও কোনও মূর্তিতে দেবীর ভ্রূ-যুগলের মাঝখানে একটি 'তৃতীয় নয়ন' আঁকা থাকতে দেখা যায়। লোকদেবতাদের উপর পৌরাণিকত্ব আরোপের স্পষ্ট প্রচেষ্টা এটি।

সিংহভাহ এলাকাতেই বড়াম দেবী বৎসরে এক দিন পূজিতা হয়ে থাকেন। কোথাও পৌষের সংক্রান্তি, আবার কোথাও বা ১ মাঘ বা 'আইখান দিন' -এ বড়াম ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয় বেশ জাঁকজমকের সাথে। সেসময় কোথাও কোথাও একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবেই, একটি মেলার আয়োজন করেন পূজাব উদ্যোক্তারা। যদিও মেদিনীপুর শহরে দেখা যায়, বড়াম নিত্য দিন পূজা পেয়ে থাকেন। এটিও ব্রাহ্মণ্যবাদেরই ফসল।

বড়াম দেবীর থানে পোড়ামাটির হাতি এবং ঘোড়া ছলন হিসাবে উৎসর্গ করবার রীতি আছে। জঙ্গলমহল এলাকা সুদূর অতীতকাল থেকে বাঘ, বাঘরোল, হায়না, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র পশুদের বিচরণ ভূমি। এইসকল শ্বাপদকুলের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদেই, গ্রামে গ্রামে বড়াম ঠাকুরের পূজার এত প্রাধান্য। শহর, গঞ্জ এলাকায় দু-একটি বড়াম মূর্তিতে বাহন হিসাবে বাঘ যুক্ত করা শুরু হয়েছে। তবে সেটি মুখ্যত বড়ামকে দুর্গার প্রতিরূপ হিসাবে মান্যতা দেওয়ার জন্য। প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার পূজায় দেবীর কাছে টেরাকোটা (পোড়ামাটির) হাতি, ঘোড়া 'ছলন' হিসাবে উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত আছে। মানুষজন বিশ্বাস করেন, এগুলি দেবীর বাহন। তিনি এগুলিতে চেপে গ্রাম এবং সন্নিহিত পাহাড়-জঙ্গল এলাকা পরিক্রমা করেন। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যাতে স্থানীয় মানুষজন এবং তাদের পোষ্য গবাদি পশুপাখির কোনও ক্ষতিসাধন করতে না পারে, তা সুনিশ্চিত করেন তিনি।

জেলার যেসকল গ্রাম শহর-গঞ্জ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত, তেমন অনেক গ্রামেই দেবীর পূজায় পশু এবং পাখি বলির প্রচলন আছে। পশু হিসাবে ছাগল, ভেড়া, এমনকি মহিষও বলি দেওয়া হয়। পাখি হিসাবে প্রধানত মুরগি বলিই দেখা যায়। কোনও কোনও দেবীর থানে মুরগিরও বাছ-বিচার আছে। ডিম পাড়েনি – কেবল এমন মুরগিই (কাটুল) দেবীকে নিবেদন করা যায় সেসকল থানে।

ধাদিকা গ্রামের বড়াম দেবী ঃ সিনি দেবীর মতো, এখানেও বিশেষ একটি বড়াম দেবীর কথা বলব আমরা। জেলার একেবারে উত্তরের থানা গড়বেতা। তারও একেবারে উত্তর সীমার গ্রাম – ধাদিকা। জেলা শহর থেকে বাঁকুড়ামুখি অহল্যাবাঈ রোডের উপরেই। ধাদিকা গ্রামের বড়াম দেবীর পূজার রীতি একটু বিশিষ্ট। বিশেষত বলি দান এবং দেবীকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করবার রীতিটি একেবারেই ভিন্ন ধরনের। যা এই জেলায় অন্য কোথাও আমরা দেখতে পাইনি। এখানে ছাগ, মোষ বা মুরগি নয়, দেবীর পূজায় শূকর বলি দানের রীতি প্রচলিত আছে। বলির পর অধিকাংশ এলাকাতেই কাটা পশুর রক্ত মাটির মালসায় ধরে দেবীকে নিবেদন করা হয়।

কোথাও আবার কাটা পশুর ধড় থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্ত সরাসরি ছড়িয়ে দেওয়া হয় পাথরের খণ্ড বা বিগ্রহের উপর। কোথাও আবার দেখা গিয়েছে, কাটা মুণ্ডটি দেবীর বিগ্রহের সামনে রেখে, তার উপরে মাটির প্রদীপ এবং ধূপ জ্বেলে সাজিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু ধাদিকা গ্রামে একটু ভিন্ন রীতি পালন করতে দেখা যায়। এখানে বলির পর, পশুটির কাটা মুণ্ড থেকে এক খণ্ড মাংস কেটে নেওয়া হয়। সেটিও কাটতে হয় বলির অস্ত্র (কাতান) দিয়েই। তারপর মাংসখণ্ডটিকে পূজাস্থলিতেই আগুন জ্বেলে পোড়ান হয়। এবার একটি মাটির পাত্রে কিছুটা দেশি মদ ঢেলে পোড়ান মাংসখণ্ডটিকে শালপাতায় রেখে দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। সেসময় বিকট শব্দে ঢাক-ঢোল, ধামসা-মাদল বাজানো হয়। দশ দিক মেতে ওঠে সেই শব্দে। উল্লাসে মেতে ওঠা জনমণ্ডলী সমস্বরে দেবীর জয়ধ্বনি করতে থাকেন। কোলাহলে পূর্ণ হয়ে যায় পূজাস্থলী।

দেবীর কাছে বলি দেওয়া মাংস সাধারণভাবে বন্টন করে দেওয়ার রীতি আছে। কোথাও অন্য মাংসের সাথে বলির মাংসের খণ্ডটি মিশিয়ে ভক্তিভরে রান্না করে খাওয়া হয়। কোথাও আবার সেই রান্না পংক্তিভোজনের রীতি আছে। এখানেও বলির মাংস রান্না করে খাওয়ার রীতি প্রচলিত। সমবেত পরিবারগুলি উপযুক্ত পরিমাণ চাল সাথে নিয়ে আসেন। সারি দিয়ে উনুন খোঁড়া হয়। যৌথভাবে ভাত ও মাংস রান্না করে উপস্থিত সকলে মিলে দেবীর প্রসাদ হিসাবে খেয়ে থাকেন।

নাচ-গানের আসর বসে বড়াম ঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে। পুরুষেরা ধামসা, মাদল, বাঁশি আর কেঁদরিতে সুর তোলেন। হাতে হাত বেঁধে, কোমর দুলিয়ে নাচ আর মিষ্টি গান করেন রমণীরা।

মেদিনীপুর শহর যেন বড়াম ঠাকুরের শহর। কত সংখ্যক বড়াম মূর্তি যে আছে এই শহরে, তার সঠিক সংখ্যা বলা কষ্টকর। একটি সমীক্ষার পর, বর্তমান নিবন্ধকারের হাতে শহরের ৩৪টি বড়াম ঠাকুরের বিবরণ আছে। এই শহরে বড়াম পূজার বৈশিষ্ট্য হলো, ঘুড়ি ওড়ানো। পৌষের সংক্রান্তি এবং পয়লা মাঘ এই দু'দিনে এই শহরে ধুম পড়ে যায় ঘুড়ি ওড়ানোর। বিশেষত পুরাতন আদি পাড়াগুলিতে মানুষজন মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন বড়াম পূজা আর ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবে।

৩. চাঁইবুড়ি ঃ

'সরল বাঙ্গালা অভিধান' (নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা ১৯০৬) গ্রন্থে সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'চাঁই' শব্দের অর্থ হিসাবে লিখেছেন — "প্রধান, সর্দ্দার,

নেতা, অগ্রণী; বড় চাপ বা খণ্ড, চাঙ্গড়"। পাশাপাশি একথাও তিনি বলেছেন যে শব্দটি 'দেশজ'। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, বাং ১৩৪০ সন) গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অর্থ হিসাবে বলেছেন — "প্রধান সর্দ্দার, ... পিণ্ড, চাপ।" আর আমরা সকলেই জানি, দেশজ 'বুড়ি' শব্দের একটি অর্থ হল – 'প্রাচীনা'। এই চাঁই এবং বুড়ি দুটি শব্দ যোগ করে নির্মিত হয়েছে 'চাঁইবুড়ি' শব্দটি। এই শব্দটি দিয়েই নির্মিত হয়েছে আমাদের বর্তমান আলোচ্য লোকদেবীর নামটি।

'বুড়ি' — এই নামেই কতসংখ্যক যে দেবী আছেন এই জেলা জুড়ে, তার ইয়ত্তা নাই। সামান্য কয়েকটি বলা যায় — ডাকাইবুড়ি (সমগ্র ঝাড়গ্রাম মহকুমার বহু গ্রামে), তেঁতুলাবুড়ি (সদর কোতওয়ালি এবং সাঁকরাইল থানায়), সাঁতাইবুড়ি (নয়াগ্রাম থানায়), বেনানীবুড়ি (কোতওয়ালি থানায়), পুকুরিয়া বুড়ি, পাথরাবুড়ি, মৌলিবুড়ি, শিকারীবুড়ি (কোতওয়ালি থানায়), নাটাবুড়ি (ঝাড়গ্রাম থানায়), পণ্ডুয়াবুড়ি (গোপীবল্লভপুর থানায়), ভর্তাবুড়ি (বেলপাহাড়ি থানায়), বলদাবুড়ি (গোয়ালতোড় থানায়) ইত্যাদি।

তালিকা রেখে, আমরা বরং মূল আলোচনায় ফিরে আসি। মেদিনীপুর সদর থানার একটি গ্রামের নাম – হরিশপুর। হরিশপুর গ্রামের বিশিষ্টতা এক লোকদেবীর অধিষ্ঠানের জন্য। সেই বিশিষ্টতার কথা গ্রামের মানুষজনও জানেন না। তাঁদের কাছে দেবী বড় আদরের ধন, কাছের জন, একেবারে পরিবারের বৃদ্ধা জননীর মতই। গ্রাম এবং দেবীর বৈশিষ্ট্য জানেন কেবল পুরাতত্ত্ববিদ এবং সমাজবিদ্যার গবেষকগণ।

এই গ্রামে আছেন 'চাঁইবুড়ি' নামে পরিচিত এক লোকদেবী। মেদিনীপুর শহর থেকে কংসাবতীর তীর ধরে 'মন্দিরময় পাথরা'-গামী পথ গিয়েছে হরিশপুর গ্রামের উপর দিয়ে। সেই গ্রামে একেবারে পথের গায়ে গাছের নিচে এই দেবীর অবস্থান। উন্মুক্ত প্রান্তরেই দেবীর থান। লোকবিশ্বাস যে মাথার ওপর আচ্ছাদন পছন্দ করে না দেবী। সেকারণেই প্রান্তরে অবস্থান তাঁর। কয়েক বছর আগে দেবীর জন্য উঁচু বাঁধানো বেদী তৈরি করে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু ওপরে কোনওরকম আচ্ছাদন ছাড়াই।

লোকমুখে দেবীর নাম – চাঁইবুড়ি। দেবী কতকালের প্রাচীন কারও জানা নাই। দেবীর আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কেবল একটি কিংবদন্তি জানেন এলাকার তাবৎ মানুষ। গোটা অঞ্চল জুড়ে সেটি প্রচলিত আছে। বহু বছর পূর্বে একবার বন্যার সময় নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এই গ্রামে এসে দেবীর যাত্রার বিরতি হয়।

এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আদেশ পান যে সাতটি পরিবারে দেবী আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁকে এনে যেন গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিমূঢ় ব্রাহ্মণ সকালে অনুসন্ধান করে দেখেন, সত্যই সাতটি পরিবারে সাতটি পাথরের দেবীমূর্তি। পাথরের বিগ্রহের রূপ ধরে বন্যার স্রোতে ভেসে এসে এই গ্রামে স্থিত হয়েছেন। তখন গ্রামবাসীদের মিলিত উদ্যোগে সাতজনকে তুলে এনে গ্রামের মাঝখানে একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চাঁইবুড়ি সর্বকল্যাণময়ী দেবী হিসাবে স্বীকৃত। সন্তানের মঙ্গল, রোগমুক্তি, বিপত্তারণ প্রভৃতি পারিবারিক সবরকম কল্যাণের আকাঙ্খায় দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান গ্রামবাসীরা। মানত করেন দেবীর কাছে এবং সুবিধামতো দিনে এসে মানত শোধ করে যান। কেউ আবার মানত শোধ করেন দেবীর বাৎসরিক উৎসবের সময়। চাঁদমালা আর মিষ্টান্ন — সামান্য উপাচারেই দেবী সন্তুষ্ট। তবে তাঁর বিশেষ সন্তোষ বিধান হয় ক্ষীরভোগ -এ। বাৎসরিক উৎসবের সময় সার সার উনুন খোঁড়া হয় দেবীর থানের পাশেই। কড়াই কড়াই পায়েস রান্না হয়। গ্রামবাসীদের ভাষায় এই 'ক্ষীরিভোগ' -ই দেবীর মূল নৈবেদ্য। দেবী এতেই অধিক সন্তুষ্ট হন। বাৎসরিক পূজার সময় এই ক্ষীরভোগ দেবীর প্রসাদ হিসাবে সমবেত ভক্তজনকে বন্টন করা হয়। এবং ভক্ত গ্রামবাসীরাও এই প্রসাদ পাওয়ার আকাঙ্খায় সম্বৎসর উন্মুখ হয়ে থাকেন।

দেবীর দক্ষিণমুখী অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি বাঁধানো উঁচু বেদীতে রাখা সাতটি পাথরের খণ্ডই দেবীর বিগ্রহ। পাথরগুলি 'ল্যাটেরাইট' বা মাকড়া পাথর গোত্রের। প্রত্যেকটি পাথরে 'বা-রিলিফ' রীতিতে একটি করে স্ত্রী-মূর্তি খোদিত আছে।

হরিশপুর গ্রামটি মেদিনীপুর শহর থেকে ২/৩ কিমি পূর্বে অবস্থিত। শহর থেকে উত্তরে প্রায় একই দূরত্বে 'বাড়ুয়া' নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামেও অনুরূপ এক দেবী আছেন, নাম — 'সাতনারায়ণী'। সেখানেও বিগ্রহ বলতে মাকড়া পাথরে খোদাই করা এই রকমই সাতটি মূর্তি। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে সেখানেও দেবীকে পায়েস রান্না করে নিবেদন করা হয়। তবে বাড়ুয়া গ্রামের রীতি হল গুড়ের পায়েসই দিতে হয় দেবীকে।

এগুলি হল এঁর দৈবী অস্তিত্বের কাহিনি। আমরা এই বিষয়টিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে পারি। পাথরে খোদিত মূর্তির এইসব লৌকিক দেবতা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী বা পুরাতত্ত্ববিদগণের কৌতুহল বহুকাল যাবৎ। সারা পৃথিবী জুড়ে এই জাতীয় পাথর দেখা যায়। সেকারণে দীর্ঘকাল এটি গবেষকদের

আলোচনার বিষয় হয়ে এসেছে। তাঁদের মতে এগুলি মেগালিথিক নিদর্শন। মাকড়া পাথরে নির্মিত যে মূর্তিগুলি দেবীর বিগ্রহ হিসাবে পূজিত হয়, সেগুলির গড়ন আয়তাকার। প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন মাপের — উচ্চতায় দু'ফুট থেকে চার ফুট পর্যন্ত। নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এগুলি সবই নারীমূর্তি। প্রত্যেকেই হাতে একটি প্রহরণ ধারণ করে আছে। প্রত্যেকটি মূর্তির পাদদেশে, অর্থাৎ পাথরটির নিচের দিকের অংশে একটি করে পশুর অবয়ব খোদাই করা। যার উদাহরণ দেখা যায় জৈন তীর্থঙ্করদের পাথরে খোদিত মূর্তিতে। গ্রামবাসীদের মতে এই পশুগুলি দেবীগণের বাহন ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এগুলি হল — 'লাঞ্ছনচিহ্ন'।

কেবলমাত্র হরিশপুর এবং বাড়ুয়া গ্রামেই যে এরকম পাথরের মূর্তি আছে, তা নয়। এই মেদিনীপুর জেলাতেই বেশ কিছু গ্রামে অনুরূপ মেগালিথিক নিদর্শন দেখা যায়। হরিশপুর গ্রামে এই দেবী 'চাঁইবুড়ি' নামে পরিচিত। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ গ্রামেই তিনি 'সাতবহনি' বা 'সাতভউনি' নামে জনসমাজে পরিচিত। বর্তমানে নিবন্ধকার তাঁর দীর্ঘ ৪২ বছরের গ্রামসমীক্ষার অভিজ্ঞতায় মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে এই ধরনের মেগালিথিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি আছে — সদর কোতওয়ালি থানার কঙ্কাবতী; খড়গপুর থানার কাশীজোড়া, সুলতানপুর ও শ্যামলপুর; নারায়ণগড় থানার চমকরামপুর, হীরাপাড়ি ও পাকুড়সেনী; জামবনি থানার নুনিয়া; স্যাঁকরাইল থানার বনপুরা; বেলপাহাড়ি থানার কাঁকড়াঝোর প্রভৃতি গ্রামে এই ধরনের নিদর্শন আছে। আবার, কেবল মেদিনীপুর জেলাতেই এগুলির অবস্থান আছে, তাও কিন্তু নয়। পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া, পুরুলিয়া কিংবা ঝাড়খণ্ডের সিংভূম প্রভৃতি জেলায়, অর্থাৎ জঙ্গলমহলের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এধরনের খোদিত পাথরের মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আরও জানা যায়, ভারতবর্ষের বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ বা সৌরাষ্ট্র অঞ্চলেও অনুরূপ নিদর্শন আছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গঙ্গার পূর্ব তীরে দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর 'সাত বিবি' নামে অনুরূপ এক লোকদেবী পূজিতা হন। তাঁদের নামগুলি — ওলাবিবি, আসানবিবি, মড়িবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি ও ঝেঁটুনেবিবি। গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাঢ় বাংলায় বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলে এঁদের নাম— রঙ্কিনী, সনকিনী, চমকিনী, যোগিনী, ডাকিনী, হাঁকিনী, শঙ্খিনী। কোথাও আবার বাশুলী, বিলাসিনী, চণ্ডী, শীতলা ইত্যাদি নামেও তাঁরা পূজা পেয়ে থাকেন। মেদিনীপুর

শহরের পশ্চিমে কঙ্কাবতী গ্রাম এলাকায় অনুরূপ যে দেবীর কথা বলা হয়েছে, সেখানে দেবীদের সাতজনের নাম — বামালসিনি, বেনাবুড়ি, হাতিধরা, লালবাবাজী, ভর্তাবুড়ি, ঠাকুরপাহাড়ি এবং বড়াম। অনুমান হয়, লালবাবাজী কোনও পুরুষ দেবতা। জেলার সাঁকরাইল থানার বনপুরা গ্রামে পূজিতা সাতজন দেবীর নাম — সাতভউনি, দুয়ারসিনি, শাঁকারিবুড়ি, দিয়াশিবুড়ি, কুবড়িয়াবুড়ি, কেঁউদবুড়ি ও গোপিয়াবুড়ি।

সাত সংখ্যার দেবী এবং তাঁদের আরাধনার ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত। ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি শাখা সাতটি পরী ভগ্নীর আরাধনা করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও সাতজন বনদেবীর পূজার প্রচলন আছে। সম্পর্কে তাঁরা পরস্পরের ভগ্নী। বিখ্যাত মীনাক্ষী দেবীর কথা আমরা অনেকেই অবগত আছি। ইনিও তাঁর আরও ছ'জন ভগ্নীর সাথে দক্ষিণাঞ্চলে পূজিতা হন। আবার, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে সাতজন পূজনীয় প্লেগ-ভগ্নীর উল্লেখ আছে বলে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু উল্লেখ করেছেন।

কোনও কোনও পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন, হিন্দুদের তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে 'সপ্তমাতৃকা'র উল্লেখ আছে — যোগেশ্বরী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, কৌমারী, ঐন্দ্রানী এবং বারাহী। সমাজবিদগণ বলেছেন, পূর্বকালে রাঢ়বাংলার যে সকল এলাকায় উপরোক্ত সপ্তমাতৃকার পূজার প্রচলন ছিল, বর্তমানে সেই সকল এলাকাতেই সাতসংখ্যক দেবীর পূজার প্রচলন আছে।

এখন আমরা দেবীর বিগ্রহ হিসাবে পূজিত পাথরের খণ্ডগুলিকে পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করে দেখতে পারি। প্রায় অনুরূপ গড়নের আর এক ধরনের পাথরও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দেখা যায়। ৪-৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সেইসব পাথরে কোনও মূর্তি খোদাই নাই। সেগুলি দেখতে কলিঙ্গ-রীতির মন্দিরশৈলীর 'শিখর দেউল' -এর অনুরূপ। লৌকিক দেবতার থান বা পীর-ফকিরদের মাজারে যেভাবে 'ছলন' হিসাবে পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া উৎসর্গ করা হয়, উড়িষ্যাতে সেইভাবে ক্ষুদ্রাকার মন্দির উৎসর্গ করার রীতি আছে। সেগুলিকে বলা হয় 'নিবেদন মন্দির'। এই দ্বিতীয় প্রকারের পাথরগুলি নিবেদন মন্দিরের অনুরূপ। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানার কিয়ারচাঁদে এই জাতীয় প্রচুর পাথর আছে। এছাড়াও আছে ডেবরার ডিঙ্গল, পিংলার নয়া, নারায়ণগড়ের গোবিন্দপুর গ্রামে। পুরুলিয়ার মানবাজার থানার টুইসানা ও বীরভূমের বক্রেশ্বর ছাড়াও, রাজ্যের বাইরে নাগাল্যাণ্ডের ডিমাপুর, উড়িষ্যার খণ্ডগিরি মন্দির চত্বর প্রভৃতি স্থানেও এজাতীয়

পাথরের নিদর্শন আছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথরগুলিকে 'শ্মশানডিরি' বলে অভিহিত করেন। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, তাঁর আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনায়, এগুলি প্রোথিত হয়। প্রায় দেড়শ' বছর পূর্বে ই. টি. ডালটন -এর লেখা একটি রিপোর্ট পাওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি -র প্রসিডিংস -এ সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটনাগপুরের কমিশনার থাকাকালীন এই ডালটন সাহেব হো-মুণ্ডাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মাটিতে পোঁতা এইরকম পাথরের স্তম্ভ দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন — "A collection of the massive grave stones indelibly mark the site of Ho or Mundari village... a megalithic monument is set up to the memory of the deceased in some conspicuous spot outside the village."। এই একই অভিপ্রায়ে নিম্নবঙ্গের হাওড়া, মেদিনীপুর জেলায় বর্ণ হিন্দুসমাজে পরিবারের মৃত প্রবীণ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে 'বৃষকাষ্ঠ' উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত আছে, আমরা জানি। বৃষকাষ্ঠগুলি দারুতক্ষণের নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে ৬/৭ ফুট দীর্ঘ কাঠে খোদাই করে নির্মাণ করা হয়।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই জাতীয় এক ধরনের পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়, ইংরেজিতে সেগুলিকে 'মেনহির' বলা হয়। কেউ কেউ সেগুলিকে ইংরেজিতে 'হিরোস্টোন' বা বাংলায় 'বীরস্তম্ভ'ও বলেছেন, বিশেষত সেগুলি যখন মৃত যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। তামিলনাড়ু রাজ্যের ভেলোর নগরীতে প্রচুর সংখ্যায় এই হিরোস্টোন দেখা যায়। সেখানে ফোর্ট -এর চৌহদ্দিতে রাজ্য পুরাতত্ত্ব দপ্তর এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ -এর দুটি মিউজিয়াম আছে। হিরোস্টোনের প্রচুর সংগ্রহ আছে রাজ্য সরকারের মিউজিয়ামটিতে। এই ধরনের স্তম্ভ বা পাথর ডালটনও দেখেছিলেন। তাঁর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রয়াত সাধারণ ব্যক্তি ছাড়াও, গ্রামবৃদ্ধ, মোড়ল, নায়কে (পুরোহিত) কিংবা বিশেষ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেও অনুরূপ স্তম্ভ নিবেদন করা হত। কেবল তা-ই নয়, পূজাও করা হত এই সকল স্তম্ভকে — "Beside the grave stones, monumental stones are set up outside the village to the memory of men of note... The Kherias have collections of these monuments in the little enclosure round their houses and libations are constantly made to them" ।

আমাদের অনুমান, অতীতকালে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই বিভিন্ন নামের পাথরগুলিকেই পরবর্তীকালে লোকসমাজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে, দেবদেবীদের নামে পূজার্চনা করে আসছেন। পশ্চিম রাঢ় এলাকায় পাওয়া

প্রস্তরযুগের আয়ুধ ইত্যাদি থেকে পণ্ডিতগণের এই ধারণার সাথেও আমরা সহমত যে, ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার সংস্কৃতিধারার সাথে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পশ্চিম রাঢ় এলাকার মেদিনীপুর অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। সেই স্রোতধারা বেয়ে মেগালিথিক সংস্কৃতির ধারাও এই এলাকায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে, একথাবলাই যায়।

৪. মা দমদমা ঃ

মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। সেদিন ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে উঁচু পাথর-টিলার উপর মা দমদমার থানে। বন-জঙ্গলে ঘেরা গ্রামগুলিতে সাড়া পড়ে যায়। সম্বৎসর অপেক্ষার দিন শেষ হল। এবার চারদিন ধরে দরখোলা গ্রামের চাটান মেতে উঠবে হাজার হাজার মানুষের সমাগমে। সেখানে মায়ের পূজা, বলিদান, পায়েসের ভোগ নিবেদন। আর টানা চারদিনের মেলা। তার সাথে থাকে কবিগান, পালাকীর্ত্তন, বাউলগান এবং বেলদা বা ঝাড়গ্রামের যাত্রাপালার জমজমাট আসর।

সারা বিশ্বের নজরকাড়া আড়াবাড়ির ঘন জঙ্গল। তারই ভিতর এখানে ওখানে ছোট ছোট গ্রাম। অভাবী মানুষজনের ঘরবসত সেখানে। তেমনই এক গ্রাম এই দরখোলা। উত্তর সীমা ছুঁয়ে বয়ে গেছে কুবাই নদী। হাজার হাজার বছর আগে এসকল এলাকাতেই ছিল আদিম মানুষদের বসবাস। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন আয়ুধ -এর নিদর্শন থেকে সেকথা অনুমান করা হয়।

দমদমা মা-র উদ্ভব শ'তিনেক বছর আগে। হুগলির সীমানা ঘেঁষা মাংরুল, ইড়পালা, পুড়শুড়ি, আমড়াপাট ইত্যাদি ঘাটালের বিভিন্ন এলাকা ছিল বন্যাপীড়িত। ফসলের অনিশ্চয়তা আর অভাব-অনটন ছিল অধিবাসীদের নিত্যসঙ্গী। তার সাথে ছিল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। পুড়শুড়ি গ্রামের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ ছিলেন ঘোষালরা। এই পরিবারের জনৈক ছকুরাম ঘোষাল ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন পরিবারশুদ্ধ। ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হন কুবাই নদীর পাড়ে বর্তমান দরখোলা গ্রাম এলাকায়। জলে ডোবা দেশের মানুষ তিনি। ঘন জঙ্গল, পাথুরে মাটি, নির্মল বাতাস তাঁর ভারি পছন্দ হয়ে গেল। সেখানেই খুঁটি গেড়ে বসে পড়লেন। বন-জঙ্গল হাসিল করে বসতবাটি গড়ে তুললেন। কিন্তু এমন গহন নির্জনে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার একা বাস করবে কী করে? ভিন্ন ভিন্ন জাত আর ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা আসতে লাগল এলাকায়। কাউকে মানা করা হল না। সকলের জন্যই এখানে দ্বার খোলা। সকলেই সুস্বাগত। নতুন জনপদের নামকরণ করা হল দ্বারখোলা। কালে কালে সেই নামই লোকমুখে 'দরখোলা' হয়ে দাঁড়াল।

পুড়শুড়ায় থাকাকালীন ঘোষাল বংশের আরাধ্যা দেবী ছিলেন 'চতুর্ভূজা শারদীয়া মৃন্ময়ী প্রতিমা'। ভদ্রাসন ছেড়ে আসবার সময় প্রতিমার মেড়ের একটি কাঠ শ্রদ্ধাভরে সাথে নিয়ে এসেছিলেন ছকুরাম। দরখোলায় এসেই সেই কাঠ দিয়ে কাঠামো বানিয়ে প্রতিমা গড়ালেন। কৌলিক রীতি মেনে দুর্গাপূজা শুরু করলেন কালিকা পুরাণের পদ্ধতি অনুসরণ করে। বলা হয়, এটিই গড়বেতার সর্বপ্রাচীন মৃন্ময়ী শারদীয়া প্রতিমা। দশভূজা নন, ঘোষালদের দুর্গা হলেন চতুর্ভূজা। ঘোষালবংশের ইষ্টদেবী হলেন জগদ্ধাত্রী এবং আরাধনার বীজমন্ত্র জগদ্ধাত্রী মন্ত্র, সেকারণেই জগদ্ধাত্রীর অবয়বেই দুর্গার চতুর্ভূজা প্রতিমা নির্মিত হয় এখানে। সনাতন রীতিতে একই মেড়ের মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশের অবস্থান। মেড়ে পট্টকার দিয়ে ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী, ভৈরবী ইত্যাদি নবদুর্গার চালচিত্র আঁকা। দুর্গার মাথার ওপরে শিব।

ঘন জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় গড়ে উঠেছে নতুন জনপদ। চারদিকে বাঘ-ভাল্লুক- নেকড়ের নিত্য উপদ্রব। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বিস্তৃত পাথর চাটান। তার লাগোয়া শাল পিয়াশাল মহুয়া গাছে ছাওয়া একটি অনুচ্চ টিলা। ভূমিতল এখানে কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের মতো উত্তল। আসন শুদ্ধিতে অধিদেবতা কুর্ম্মের পৃষ্ঠতলের যে কথা আছে, একেবারেই তার মতো। এমন স্থানে বসে যে কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় সহজেই। এরকম উঁচু স্থানকে 'দমদমা' বলা হয়।

দুর্গাপূজা শুরুর আগেই ঘোষালকর্তা স্বপ্নাদেশ পেলেন, সেই দমদমায় মা চামুণ্ডা এবং বাবা ভৈরব মাটির নিচে যন্ত্রস্থ আছেন। ঘোষাল বংশ চিরকালের শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার। সাথে সাথে বিপুল সমারোহ করে দুই দেবতাকে উদ্ধার করে, সেখানেই প্রতিষ্ঠা করা হয় তাঁদের।

সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল দেবী চামুণ্ডার আরাধনা। ঘোষালবংশই দেবীর একমাত্র পূজক। কেবল অশৌচকালে, সেবার জন্য দৌহিত্রদের সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনশ' বছর পরে আজও দেবী বৃক্ষতলেই আসীনা। মন্দির নির্মাণ বা বেদী তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করেও পারা যায়নি। স্বয়ং দেবীরই নাকি সম্মতি নাই তাতে।

লৌকিক দেবতা ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে পৌরাণিক দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, এমন নজির সকলেরই জানা। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশের পৌরাণিক দেবী, শত শত বছর ধরে, সাধারণ লোকসমাজের কাছে লৌকিক দেবতা হিসাবে পরিগণিত হয়ে চলেছেন, এমন নজির বড় একটা নাই। এখানে মা দমদমা তেমনই এক বিরল দৃষ্টান্ত।

কেবল ঘোষাল বংশই বলেন, দেবী হলেন চামুণ্ডা। কিন্তু দমদমার উপর অবস্থান, গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে, লোকমুখে তিনি 'মা দমদমা' নামেই পরিচিত হয়ে আছেন। লোকসমাজে বড় আদরের, বড়ই আপনার দেবী তিনি। সারা গড়বেতা জুড়েই তাঁর বিপুল খ্যাতি। সকলেই তাঁকে মান্য করেন। পারিবারিক সবরকম কাজই দেবীকে জানিয়ে করা হয়, সাফল্য আসে তাতে। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ সবরকম শুভ কাজেই মণ্ডপে 'পায়েস ভোগ' নিবেদন করে, সেই প্রসাদ সকলকে বিলি করা হয়। মাঘমাসের বড় পূজা ছাড়াও, আষাঢ় মাসের শয়ন একাদশী তিথিতে গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে জাঁতাল (ভোগ) নিবেদন করেন দেবীকে। তাতে কৃষিকাজের জন্য সুবৃষ্টি হবে, এমনই বিশ্বাস মানুষজনের। গবাদি পশুর রক্ষক তিনি। গাভীর সুপ্রসব, উপযুক্ত দুগ্ধবতী হওয়া, হারানো গরু-বাছুরের সন্ধান – সবরকম মনস্কামনাই দেবী পূর্ণ করেন। তাই তাঁর এত আদর, তাই তিনি সাধারণ মানুষের এত আপনার জন্য।

মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক বড় পূজা। সে দিনটির জন্য সারা বছর হা-পিত্যেশ অপেক্ষা করে থাকে গোটা এলাকা। আশপাশের গ্রাম-গঞ্জ ভেঙ্গে মানুষের ঢল নামে তাঁর পূজায়। কানায় কানায় ভরে ওঠে টিলার উপরে দেবীর থান আর নিচে পাথর চাটানের মেলা প্রাঙ্গণ।

৫. বলদাবুড়ি ঃ

'বুড়ি' নামযুক্ত এই আর এক দেবী, মেদিনীপুর আর বাঁকুড়া দুই জেলার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যিনি আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছেন। গোয়ালতোড় থেকে সারেঙ্গা যাওয়ার পথে বাঁকুড়া লাগোয়া এক গ্রাম শালবনি। সেই গ্রামে উঁচু-নিচু মাঠঘাটের ছোট ছোট ঝোরা মিলে জন্ম হয়েছে এক পাহাড়ি নদী, তার নাম তমাল। তমালের সেই উৎস মুখে বহুকাল ধরে এক লোকদেবীর অবস্থান। দেবী বলতে একটি পাথরের খণ্ড। আর তার সামনে তৈরি গুটিকয় হাত আর ঘোড়ার ছলন।

জঙ্গলমহলে গবাদি পশুকে নিয়ে ভয় লেগেই থাকে হারিয়ে যাওয়ার, জঙ্গলের জানোয়ার বা দুর্বৃত্তের হাতে পড়ার, আহত হওয়ার। সেই ভয় থেকে বাঁচাবার জন্যই আছেন এক গ্রামদেবী। শিষ্টজনেরা নাম বলেন বলদবাহিনী দেবী। কিন্তু সাধারণের মুখে তিনি — বলদাবুড়ি।

শালগাছের ছায়ার থানটিতে আগে একটি চালাঘর ছিল। একবার পার্শ্ববর্তী বুলানপুরের কন্যা আর শালবনি গ্রামেরই বাসিন্দা চারুবালা দাসী দেবীর কাছে মানত করে মামলা জিতেছিলেন। তাই তিনিই ছোট একটি পাকা মন্দির করে দিয়েছেন

দেবীর জন্য, বাংলা ১৩৬০ সনে। এখন মন্দিরের ভেতরে আছে অষ্টধাতুর তৈরি একটি মনুষ্য-মস্তক, দেবীর প্রতীক হিসাবে। পাশে একটি ক্রুদ্ধ বলদ। এবং পোড়ামাটির কয়েকটি হাতি আর ঘোড়া। গৃহস্থের গোরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া-মহিষ লক্ষ্য রাখতে হয় তাঁকে। এই ছলনের হাতি-ঘোড়ায় চড়েই তিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান। কখনও মানুষজনের চোখেও পড়েছে, হাতে লাঠি নিয়ে হাতি বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মা বলদাবুড়ি। লোকমুখে শোনা যায়, একবার পাশের পিতলি গ্রামে বেড়াবার সময় এক গৃহস্থকে দুধ খেতে চেয়েও পাননি তিনি। দেবী রুষ্টা হলেন। ফলে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত পিতলি গ্রামের গাভীরা ভাল পরিমাণ দুধ দেয় না। এসব কারণে, দেবীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য হাতি-ঘোড়ার ছলন দিয়ে যায় লোকে। আর ঘটি ভর্তি দুধ। ছলনের সেইসব হাতি-ঘোড়া ছড়িয়ে আছে মন্দিরের চারদিকে।

মন্দিরের সামনে একটি প্রাচীন নিমগাছের নিচে মানতের বলি দেওয়া হয়। হাড়িকাঠের সামনে একটা পাথর রাখা আছে, তার নাম 'রক্তপাথর'। পাঁঠা এবং মোরগ বলির প্রথম রক্ত এই পাথরে দিতে হয়, তাই এমন নাম হয়েছে পাথরটির। নিত্য পূজা হয় দেবীর, বেলা ঠিক দু'প্রহর অতীত হলে। তবে শনি আর মঙ্গলবারে ভীড় হয় বেশি। বছরে একদিন দেবীর বিশেষ বড় পূজা, ১ মাঘ আইখান দিনে। সেদিন অনেক বলির রক্তে ডুবে যায় পাথরটি।

জঙ্গলমহলে এই এলাকায় বলদাবুড়িই গবাদি পশুর রক্ষয়িত্রী জননী। গোরু হারিয়ে গেলে, গাভির বাঁটে দুধ কমে গেলে, মাকে স্মরণ করে মানুষজন। মানতকারীর নামে ফুল চাপান পূজারি। গোরুটি জীবিত না মৃত, ছাড়া আছে না এখন কোথাও বাঁধা পড়েছে, কিংবা আছে কোন দিকে – সব হদিশই মিলে যায় মায়ের থানে। গাভির সুপ্রসবের জন্যও লোকে মানত করে মাকে। প্রথম দুধ নিবেদন করে যায় মায়ের থানে এসে। এমন যিনি দয়ালু, উপকারী, তাঁর কাছে আসার কোনও ভেদ নাই। উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণের সকল হিন্দু, সাঁওতাল সহ সকল আদিবাসী সম্প্রদায়, এমনকি গোরু-ছাগলের ব্যবসায়ী মুসলমানরাও মানতের বলি দিয়ে যান বলদাবুড়ি দেবীকে।

কোন অতীত কালে বারোটি গ্রামের মোড়লরা দেবীর আরাধনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল বুলানপুর গ্রামেরই মাল পদবীর তপশিলিদের হাতে, সেটাই আজও চলে আসছে। বলদাবুড়ির মন্দিরে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করে বলা বারণ। চলে আসছে সেই রীতিও।

পৌষের শেষ দিন মকর সংক্রান্তিতে রাঢ়বাংলার গ্রামে গ্রামে কত না লৌকিক দেবদেবীর উৎসব হয় ঘটা করে। কিন্তু বলদাবুড়ির পূজার সেদিন বিরতি। সেদিন বুড়ির স্নানপর্ব, বছরে এই একদিন। পরদিন পয়লা মাঘে ঘটা করে পূজা। উপাচার হিসাবে থাকে পান-সুপারি-দোক্তা-চুন; চিড়া-গুড়-মিষ্টি-বাতাসা; যেকোনও রকম ফলমূল। কিন্তু বড়পূজার বড়ভোগ হল দেশি মদ। মানত শোধের পূজা দিতে ভক্তরাও মদ নিয়ে আসেন। মায়ের সামনে ঢালা মদ সব জমা হয় একটি পাত্রে। পূজার শেষে শালপাতার ঠোঁঙায় ভক্তদের হাতে বিলি করে দেওয়া হয় সেই প্রসাদ।

পাঁঠা বা মোরগ মানত করা হয় দেবীর কাছে। পায়রাও উৎসর্গ করেন অনেকে। কিন্তু পায়রাগুলি বলি দেওয়া হয় না। মাথায় পূজার সিঁদুরের টিপ পরিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয় আকাশে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

সেদিন বড়পূজা। ধর্মবর্ণের কোনও বাছবিচার নাই সেদিন। আশপাশের বহু গ্রাম থেকে বহু মানুষের জমায়েত হয়। পূজার দিন নদীর পাড়ে বেশি উৎসাহ দেখা যায় আদিবাসী মানুষদের মধ্যে। ধামসা-মাদল-কেঁদরি-বাঁশি নিয়ে নাচ-গানে মেতে ওঠেন তাঁরা। সন্ধ্যায় মন্দিরে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন গানও হয়।

দু'দিনের জন্য মাঝারি মাপের একটা মেলা বসে যায় তমাল নদীর ধারে। সাধারণ মানের জিনিষপত্র সব। খাওয়ার দোকান। মেয়েদের সস্তা প্রসাধনী, ছোটদের খেলনাপাতি, পোষাক-পরিচ্ছদ। সবই আছে। দেশি মদের দোকানও থাকে সেই মেলায়। সেসব কিনে মন্দিরে উৎসর্গ করতে যান ভক্তরা।

৬. কালষণ্ডা দেবী ঃ

কত নামে কত মূর্তিতেই না লৌকিক দেবদেবীগণ বিরাজিত আছেন। তাঁদের আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠা নিয়েও আছে কত না কাহিনী। শালবনি থানার দেউলি গ্রামে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক দেবতা আছেন। তাঁর নাম — কালষণ্ডা।

নামটি শুনতে পুং-লিঙ্গ বাচক মনে হলেও, ইনি প্রকৃতপক্ষে একজন দেবী। কোনও পুরুষ দেবতা নন। আবার, নামটি উচ্চারণ হওয়া মাত্রই ভীতির সঞ্চার হয় মনে। প্রথমেই কোনও এক ভয়ঙ্কর শক্তিধরের কথা মনে চলে আসে। সত্য সত্যই ভয়ঙ্কর শক্তিধর এই দেবতা। তবে এই লৌকিক দেবতার আবির্ভাব নিয়ে যে কাহিনী প্রচারিত আছে, তা একান্তই অলৌকিক।

খয়রাপাড়া আর মাঝিপাড়া — এই দুটি পাড়া নিয়ে দেউলি গ্রামের গঠন। মৌজা নং ২৬৫, থানা শালবনি। মাওবাদী আন্দোলন আর কিষেণজীর নামে যে জঙ্গল এলাকা একদিন ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিল, তার ভিতরেই দেউলি গ্রামের

অবস্থান। মেদিনীপুর শহর ছাড়িয়ে উত্তর মুখে ৫কিমি উজিয়ে গেলেই ভাদুতলা গঞ্জ। সেখান থেকে একেবারে লালগড় পর্যন্ত বিস্তার এই জঙ্গলের। লালগড় পর্যন্ত-ই বা বলি কেন। লালগড়ে কংসাবতী নদীটিকে পার হয়ে, এই জঙ্গল ছড়িয়ে আছে একেবারে ঝাড়খণ্ড রাজ্য পর্যন্ত। ঘন সবুজ থিকথিকে জঙ্গলের মাঝে সরু একটি ফিতের মতো দেখায় এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া কংসাবতী নদীটিকে। সবুজ শাড়ির বালি-রঙা পাড় যেন।

যাক সেসব। ভাদুতলা থেকে লালগড়গামী রাস্তায় সাতপাটি বাজার। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় কিছুটা পথ ভেঙে দেউলি গ্রাম। মূলত খয়রা, মাঝি আর ভূমিজ -এই তিন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গড়া এই গ্রামের জনসংখ্যা। এই গ্রামেই একটি প্রাচীন বটগাছের তলায় কালষণ্ডা দেবীর অধিষ্ঠান। বছরে একদিন তাঁর বড়-পূজার আয়োজন হয়। সে প্রসঙ্গের আগে, আমরা দেবীর আবির্ভাবের কাহিনীটি জেনে নিতে পারি।

জঙ্গলে ঢাকা এলাকা। ঘরের আর পরের গরু চরানো এই এলাকার কিশোর ছেলেদের চিরকালীন কাজ। গোরু চরাবার ফাঁকে, একবার একদল রাখাল ছেলে একটি বড় উইঢিবিকে দেবতা মেনে পূজার আয়োজন করেছিল। সত্যি পূজা নয়, রাখাল ছেলেদের পূজা-পূজা খেলা। সেই পূজায় একটি রাখাল ছেলেকে বলি দেওয়ার জন্য তালপাতার খড়্গ বানিয়ে কোপ বসালে, সত্যি সত্যিই আস্ত মাথাটি কাটা পড়ে ছেলেটির। এমন ঘটনা কোথাও ঘটেছে, না কেউ দেখেছে কোনও দিন? গ্রামশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছিল জঙ্গলে ঘেরা বটের তলায়। পরে পুত্রহারা বাবা-মায়ের বুকফাটা কান্নায় যখন বনের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, তখন নাকি একটি কালো ষাঁড় বলি দিয়ে পূজা দেওয়া হয় সেখানে। তাতে গ্রামদেবীর করুণায় পুনর্জীবন ফিরে পায় রাখাল বালকটি।

কতকাল আগের ঘটনা কেউ জানে না। তবে বলা হয়, সেদিন থেকেই কালষণ্ডার পূজার প্রচলন হয়েছিল দেউলি গ্রামে। 'কালো ষাঁড়' বলি দেওয়ায় দেবী প্রীত হয়েছিলেন, সেকারণেই তাঁর নাম হয় — 'কালষণ্ডা দেবী'। এমন চমৎকার ঘটনার প্রচার হতে সময় লাগেনি। দ্রুত শালবনি এবং পার্শ্ববর্তী গোয়ালতোড় থানার ব্যাপক এলাকা জুড়ে দেবতার প্রভাবমণ্ডল গড়ে উঠেছে।

কোনও মূর্তি বা মন্দির নাই দেবীর। চল্লা, কুচলা, কদম ইত্যাদি গাছের জটলার ভিতর বটের তলায় থান (বর্তমানে বাঁধানো) গড়ে তুলে পূজার প্রচলন হয়েছে কালষণ্ডার। মানত থাকলে, শনি / মঙ্গল বারে ফুল-বাতাসা দিয়ে পূজা হয়। বাৎসরিক পূজার অনুষ্ঠান হয় ১ মাঘ, একদিনের জন্য। সেদিন ক্ষীরভোগ নিবেদন

করা হয় দেবীকে। 'সর্দার' পদবির খয়রা জাতির পুরোহিত। পূর্বে ষাঁড়ই বলি দেওয়া হত দেবীকে। বহুকাল তা স্থগিত। বর্তমানে ছাগ ও মোরগ বলি হয়।

দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে একটি মেলার আয়োজন হয় বহু অতীতকাল থেকে। বনের ভিতর মেলা, কিন্তু লোক সমাগম আর কেনাবেচার কোনও ঘাটতি হয় না তাতে। মেদিনীপুর, পিড়াকাটা, গোদাপিয়াশাল, শালবনি, আনন্দপুর, সাতবাঁকুড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে দোকানদারের দল মেলায় আসেন পসরা নিয়ে। এই মেলার বহুকালের বৈশিষ্ট্য হলো মিষ্ঠান্ন, মনোহারি এবং কাঁসা-পিতলের জিনিষপত্রের ব্যাপক আমদানি। এগুলি মেদিনীপুর, শালবনি, পিড়াকাটা ইত্যাদি এলাকার ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসেন। এর সাথে তাকে বাঁশ এবং বেতের তৈরি ঘরকন্নার হরেক রকম জিনিষ। এগুলি আসে কাছে-দূরের বিভিন্ন গ্রাম থেকেই। বনজ সম্পদ থেকে গ্রামীণ কারিগরেরা এগুলি তৈরি করেন। মাটির তৈরি হাঁড়ি-কুঁড়ি এবং খেলনা-পুতুলেরও চোখে পড়বার মতো সমাবেশ ঘটে। সম্বৎসরের ঘরকন্নার জিনিষপত্র সংগ্রহ করে নেওয়া যায়। মূলত সেকারণেও কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত দেখা যায় মেলাটিতে।

৭. মা গুপ্তমণি ঃ

যে গ্রামে মা গুপ্তমণি দেবীর মূল অধিষ্ঠান, তার নাম — শুগনিবাসা। অধুনা ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম থানায় ১০নং দুধকুণ্ডি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সরকারি নথিপত্র ছাড়া শুগনিবাসা নামের কোনও পরিচিতিই বোধকরি আর নাই। 'গুপ্তমণি' নামেই এটি কয়েকশ' বছর ধরে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এখানে বিপুল প্রতাপশালিনী, বিপুল প্রভাবশালিনী যে লোকদেবী বিরাজিত আছেন, তাঁরই নাম – মা গুপ্তমণি। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই, স্থাননামটি গড়ে উঠেছে এই লোকদেবীর নাম থেকে।

দেবী গুপ্তমণির উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীটি পাঠকবর্গকে জানানো প্রয়োজন। কোনও লিখিত ইতিহাস নাই। লোধা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি লোকশ্রুতি আছে। প্রায় সওয়া দু'শ বছর আগে, লোধা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি দেবী বনচণ্ডীর স্বপ্নাদেশে পেয়েছিলেন। সেই অনুসারে একটি জঙ্গলের ভিতর একটি শ্যাওড়াগাছের তলায় মাটির নিচে একটি পাথরখণ্ডের সন্ধান পেয়ে, সেটির পূজার সূচনা করেন। এর কিছুকাল পরে, একদিন হঠাৎই একটি মত্ত হাতি বনজঙ্গল লণ্ডভণ্ড করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। দেখা যায়, দেবী স্বয়ং চিহড় লতার বাঁধনে হাতিটিকে বেঁধে রাখলেন।

হাতিটি ছিল ঝাড়গ্রামের রাজার। দেবী রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে জানিয়েছিলেন, হাতিটিকে তিনি আটকে রেখেছেন। পরদিন রাজার পাইক এসে সেটিকে নিয়ে যায়। রাজার হাতিশাল থেকে বেরিয়ে আসা শিকল-ছেঁড়া পাগলা হাতি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ, শান্ত। দেবীর পুরোহিতকে পারিতোষিক দিয়ে, দেবীর থান -এর উপর ছোট আকারের একটি মন্দির গড়ে দিয়েছিলেন রাজা। এতকাল মাটির নিচে অপ্রকট বা গুপ্ত ছিলেন দেবী, সে কারণে তাঁর নাম হয়ে যায় — মা গুপ্তমণি চণ্ডী।

গুপ্তমণি লোকদেবী এবং লোধা পূজকের দ্বারা পূজিতা। কিন্তু তিনি সমগ্র লোধাজাতির সর্বজনীন দেবী নন। কেবলমাত্র শুগনিবাসা গ্রামের 'ভক্তা' পদবির বিশেষ একটি লোধাবংশই দেবীর সেবাপূজার অধিকারী। লোধাদের অনেকগুলি পদবি — কোটাল, মল্লিক, নায়েক, দিগার, ভক্তা, দণ্ডপাট, পরামাণিক, আহরি ও ভুঁইয়া। এখানে ভক্তা পদবীর লোধা বংশটিই দেবীর পূজক। জনৈক নন্দ ভক্তার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে দেবীর পাথর-বিগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। সেকারণে নন্দ ভক্তার উত্তরপুরুষগণই দেবীর পূজা করে চলেছেন।

সাঁওতাল, মুণ্ডা বা হো সম্প্রদায়ের মতো, লোধারাও অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। লোধারাও ১ মাঘ দিনটিকে আইখান-যাত্রা বা নববর্ষ -এর সূচনা দিন হিসাবে মান্য করেন। পাহাড়-পূজা এঁদের ঘরে ঘরে দেখা যায়। সেসময় বড়াম (গ্রামদেবী), কিতাপাট, বসুমাতা (ধরিত্রীদেবী), মা যুগিনী (বাতাস ও মারীরোগের দেবী), বিজলীকন্যা (বজ্রবিদ্যুতের দেবী), পবনবীর, শিবঠাকুর, বাঘুৎ-ঠাকুর ইত্যাদি দেবতার পূজাও করেন এঁরা।

সাধারণভাবে এইসব দেবদেবী লোধা সম্প্রদায়ের উপাসিত হলেও, এঁদের মুখ্য দেবতা হলেন চণ্ডী। তাঁর সাতটি রূপ এবং পৃথক পৃথক নামের বিগ্রহকে পূজা করেন এঁরা — জয়চণ্ডী, বড়ামচণ্ডী, ভৈরবীচণ্ডী, বনচণ্ডী, দুয়ারসিনিচণ্ডী, শীতলা এবং বসুমাতা। এখানে শুগনিবাসা গ্রামে বা গুপ্তমণিতে মা গুপ্তমণিকে চণ্ডী বা দুর্গা হিসাবেই উপাসনা করা হয়।

লোধাদের ভাষায় পুরোহিত হলেন – দেহরি। দেহরি কোনও মন্ত্র জানেন না, পূজা করেন হৃদয়ের ভক্তি এবং নৈবেদ্য নিবেদন করেই। ৬নং জাতীয় সড়ক বা মুম্বাই রোডের উপর (হাওড়া থেকে পশ্চিম মুখে খড়গপুর চৌরঙ্গী পার হয়ে লোধাশুলির পর) গুপ্তমণি দেবীর মন্দির। যাত্রীদের আনাগোনা লেগেই আছে মন্দিরে। ভক্ত সমাগমের কারণে, নিত্য পূজার প্রচলন হয়েছে দেবীর। শনিবারে

মানুষের ঢল নামে মন্দিরে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের অনুকরণে, ছাউনি-ঢাকা 'প্রদক্ষিণ পথ' আর দীর্ঘ লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মানত শোধের পূজা, ছেলে-মেয়ের বিবাহ, নতুন কেনা গাড়ির পূজা লেগেই থাকে মন্দিরে। শাড়ি, চক্ষুদান ছাড়াও, সিংহভাগ পূজাতে, বিশেষত মানত শোধের সময়, বলি দানের রীতি আছে দেবীকে। পায়রা, হাঁস, ছাগল, এমনকি মহিষ বলিও প্রচলিত আছে এখানে। প্রতিদিন বলির রক্ত ঢেলে যোনিপীঠ বা দেবীর অবস্থানের 'গম্ভীরা'টিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তবে পায়রা কেবল উৎসর্গ করে উড়িয়ে দেওয়া হয়, বলি দেওয়া হয় না।

অন্যান্য লোকদেবতাদের মতো বছরে একবার নয়, গুণে গুণে বছরে তিন বার বড় উৎসর্গ করে গুপ্তমণির – অম্বুবাচী, বিজয়া দশমী এবং মকরসংক্রান্তি। আদিবাসী সমাজে বিজয়া দশমীর দিনটি বিশেষ গুরুত্বের – বিশেষত ঝাড়গ্রাম জেলায়। গোপীবল্লভপুর থানার ছাতিনাশোল এবং বিনপুর থানার ওড়গোন্দা গ্রামে বিখ্যাত দুটি আদিবাসী মেলা বিজয়া দশমীতেই অনুষ্ঠিত হয়। মা গুপ্তমণির মন্দিরে বিজয়ার পূজা হয় হাজার হাজার মানুষের সমাগমে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে। মেলাও বসে সেই উপলক্ষ্যে।

রাজপথের একেবারে গায়েই শাল-মহুল-অর্জুন-ষঁড়াল (অমলতাস বা বাঁদরলাঠি) গাছের তপোবন সদৃশ একটি ঘেরা এলাকা। তার ভিতর দেবীর অবস্থান একটি শ্যাওড়াগাছের নিচে। এলাকার মানুষজনের নিত্য আসা-যাওয়া তো আছেই। রাজপথ বেয়ে ছুটে চলা গাড়ির স্রোতও দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে এখানে। মা গুপ্তমণি পৌরাণিক নালোকদেবী, তাঁর পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণ করেন না কি একেবারে প্রান্তবাসী একজন লোধা পূজক, এসকল কূট প্রশ্ন ওঠে না কোনদিন। তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ ধনী বা দরিদ্র, ব্যস্তসমস্ত বা সাধারণ মানুষ সকলেই একবার দাঁড়িয়ে পড়েন দেবীর সামনে। নিজের নিজের গন্তব্যে চলে যাওয়ার পথে একবার সকলে প্রণত হয়ে যান মা গুপ্তমণির সামনে।

সাত লোকদেবীর বিবরণ রইল এখানে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অঞ্চলের, বিশেষভাবে জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকার হাজার লক্ষ মানুষের রক্ষাকর্ত্রী এঁরাই। জননীর মতো এই সাতজন দেবী যুগ যুগ ধরে আগলে রেখেছেন তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের। সাত জননীকে নিবন্ধকারের প্রণাম।

গ্রন্থসূত্র ঃ

১. 'বিশ্বকোষ' (এনসাইক্লোপিডিয়া ইণ্ডিকা) / সংকলন : শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন। দিল্লী ১১০ ০০৭।

২. পুরাণগ্রন্থ — কুর্ম্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ইত্যাদি।

৩. মেদিনীপুরের ইতিহাস / যোগেশচন্দ্র বসু। স্বদেশ, ১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬।

৪. মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২য় খণ্ড / সম্পাঃ কমল চৌধুরী। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

৫. বাংলার লৌকিক দেবতা / গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

৬. লোকায়ত ঝাড়খণ্ড / ড. বিনয় মাহাত।

৭. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি - ৪র্থ খণ্ড / বিনয় ঘোষ। প্রকাশ ভবন, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

৮. মেদিনীপুরের লৌকিক দেবদেবী / অজয় কুমার মণ্ডল। কবিতিকা, মেদিনীপুর।

৯. 'হাতি ধরা মা' – নিবন্ধ / দীপঙ্কর দাস। গ্রন্থ ঃ মেদিনীপুরের ইতিহাস - ২য় খণ্ড / সম্পাদনা - কমল চৌধুরী।

১০. 'শহর মেদিনীপুরের ধর্মচেতনা' - নিবন্ধ / চিন্ময় দাশ। গ্রন্থ ঃ শহর মেদিনীপুরের কথা / সম্পাদনা - তাপস মাইতি। উপত্যকা প্রকাশনী, মেদিনীপুর।

১১. মেদিনীপুরের গ্রামের কথা, ৫ম খণ্ড / সম্পাঃ তাপস মাইতি। (নিবন্ধ ঃ হরিশপুর / চিন্ময় দাশ)।

১২. BENGAL DISTRICT GAZETEERS MIDNAPORE / L. S. S. O'Malley. Government of West Bengal. Kolkata. 1995 (Re-print)

১৩. Rude Stone Monuments in Chutia Nagpur (Abstract) / E. T. Dalton : Proceedings, Asiatic Society, 1873.

১৪. The Kols of Chota Nagpur / E. T. Dalton : Transactions of the Ethnological Society of London, 1867.